প্রবন্ধ

অম্বুবাচির মর্ম নারীবাদীরা বোঝেননি

প্রাচীন হিন্দু ধর্মে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে, নারী ও ধরিত্রী, দুইয়েরই উর্বরতা এবং অনুর্বরতার স্বাভাবিক চক্রটি নিয়ে লজ্জার কোনও কারণ নেই, বরং তা হল উৎসব করার ব্যাপার।

জহর সরকার

২৪ জুন, ২০১৬, ০০:০০:৪৯

পিতৃতন্ত্রের মুখোমুখি। কামাখ্যা মন্দিরে অম্বুবাচিতে কলস যাত্রা। গুয়াহাটি, জুন ২০১১

হিন্দুধর্ম হল পৃথিবীর প্রাচীনতম জীবিত ধর্ম। এই ধর্মে এখনও কিছু খুব পুরনো নিয়ম বহাল রয়েছে, যেগুলো সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হয়নি, আধুনিক জীবনের আঙ্গিকে সেগুলি বেমানান। সময়ের সঙ্গে রীতিনীতিগুলো বদলালে জীবনের কিছু কঠোর বাস্তবকে স্বীকার করে নেওয়া অনেক সহজ হত। বস্তুত, কিছু আধুনিক মেয়ে, মা-ঠাকুমাদের অশেষ অস্বস্তিতে ফেলে, ঋতুচক্র বিষয়ে তাদের পুরুষ বন্ধু বা সহকর্মীর সঙ্গে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বা লোকসমক্ষে কথা বলা শুরু করার আগে অবধি অত্যন্ত সচেতন ভাবে এই বিষয়ে সমস্ত কথা চেপে রাখা হয়েছে— কেবল গুজগুজ, ফিসফিস। অথচ প্রাচীন ভারতে এই বিষয়টিকে একেবারেই গোপন করা হয়নি, বরং বহু শতাব্দী ধরে এমন কিছু উৎসব ভারতে পালন করা হয়ে এসেছে, যা অন্য ধর্ম অগ্রাহ্য করেছে। এই ধরনের উৎসবগুলির মধ্যে একটি হল মাতৃকাদেবীর ঋতুচক্র উদ্‌যাপন— অম্বুবাচি। ধরিত্রীর এই উপাসনা করা হত যাতে শস্য ও সবজির প্রচুর ফলন হয়। শ্রীদেবী, মহালক্ষ্মী ও শাকম্ভরী-রূপী দুর্গার পুজো খুব প্রাচীন, এগুলি এই মাতৃবন্দনার বিভিন্ন রূপ। উর্বরতা এবং অনুর্বরতার এই স্বাভাবিক চক্রটির মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে— এই ধারণাটি প্রাচীন হিন্দু ধর্মে খুব স্পষ্ট ছিল, ফলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে, এ নিয়ে লজ্জার কোনও কারণ নেই, বরং তা উৎসব হিসেবে উদ্‌যাপন করাটাই ছিল প্রথা।

সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার বিশ্বাস ছিল, উৎপাদনশীলতার চক্রে নারী ও ধরিত্রী খুব আশ্চর্য ভাবে পরস্পর সম্পর্কিত। এবং পুরুষ চিরকালই এই ক্ষমতার জন্য উভয়ের প্রতিই হয় মুগ্ধ হয়েছে অথবা ঈর্ষান্বিত। মেসোপটেমিয়ায় প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে, দেবী নিনহুরসাগ ‘মানবিক মৃত্তিকা’য় তাঁর ‘জীবনের রক্ত’ সঞ্চালিত করেছেন। বস্তুত, অ্যাডাম বা আদম নামটি এসেছে স্ত্রী-বাচক ‘আদামা’ থেকে, যার মানে ‘রক্তাক্ত মৃত্তিকা’, যদিও পণ্ডিতরা একটু ঘুরিয়ে বলেছেন ‘লাল মাটি’। স্পষ্টতই, বাইবেলে আদমের কাহিনি প্রাচীনতর নারী-কেন্দ্রিক সৃষ্টির গল্প থেকে এসেছে। প্রাচীন গ্রিসে ঋতুরক্তের জায়গায় আনা হয় অলৌকিক রেড ওয়াইনকে, মাতৃদেবী হেরা-কে যা উৎসর্গ করা হত। নর্স দেবতা থরও এই রক্তের নদীতে স্নান করে পুনর্জন্ম পেয়েছিলেন। প্রাচীন মিশরের বিশ্বাস ছিল, দেবী আইসিস-এর ঋতুরক্তই ফারাওদের অমরত্বের উৎস। রোমান আমলে গ্রিক ইতিহাসবিদ

প্লুটার্ক বলেছিলেন, মানুষ মাটির তৈরি, তার জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋতুরক্ত আসে চাঁদ থেকে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিশ্বে বহু প্রাচীন সমাজেই এই রক্ত সার্বভৌম ক্ষমতার বাহক হিসাবে গণ্য হত, কারণ গোষ্ঠী বা জনজাতির জীবনধারা এর মাধ্যমেই প্রবাহিত হত। চিনের প্রাচীন পণ্ডিতরা এই রক্তকে জননী ধরিত্রীর মূল চরিত্র মনে করতেন, বলতেন, এটাই হল ‘য়িন’, যা আছে সমস্ত প্রাণের আদিতে। বহু দূরের দক্ষিণ আমেরিকাতেও প্রাচীন ইন্ডিয়ানরা বলেছিলেন, সমস্ত মানুষ ‘চাঁদ-রক্ত’ থেকে জন্ম নিয়েছে!

জুডাইজম, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের মতো সংগঠিত সেমিটিক ধর্মগুলির অভ্যুদয়ের পরে নতুন পিতৃতন্ত্র মেয়েদের প্রতি এই শ্রদ্ধার ধারায় পরিবর্তন ঘটাল, যদিও এদের অনেকগুলিই মেয়েদের জন্য একটা পরিসরও রেখে দিল। বেশির ভাগ প্রাচীন ও কট্টর চার্চ ঋতুস্রাবের সময়ে মেয়েদের ‘কমিউনিয়ন’ গ্রহণের অধিকার দেয়নি, তবে কিছু কিছু চার্চ তুলনায় উদার ছিল। ইহুদি এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রেও এ ধরনের বাধা আছে। অনেক দূরের জাপানে আর একটি সংগঠিত ধর্ম শিন্তোবাদেও বলা হয়েছে, কারও দেহে রক্ত, ধুলো বা মৃত্যুর স্পর্শ থাকলে আরাধ্য শক্তি তার মনস্কামনা পূরণ করেন না। হিন্দুদের ক্ষেত্রে জননী ও তাঁর ঋতুকালকে আরাধনা করার প্রাচীন রীতির অবসান ঘটেছিল মেয়েদের ওপর পিতৃতান্ত্রিক ধর্মের নানা বিধিনিষেধের মধ্যে দিয়ে, এখন যেগুলির বিরুদ্ধে সংগত কারণেই প্রবল প্রতিবাদ হচ্ছে।

পূর্ব ভারতের দিকে তাকানো যাক, বিশেষত গুয়াহাটির নিকটবর্তী কামাখ্যা মন্দিরে। এটি আদিতে তান্ত্রিক আচারের কেন্দ্র। জুন মাসের শেষে ধরিত্রীর ঋতুকাল উদ্‌যাপন— অম্বুবাচি— এক সর্বজনীন উৎসব, নানা মেলা ও অনুষ্ঠান জমে ওঠে তাকে ঘিরে। এই শক্তিপীঠটিতে নাকি সতীর যোনি পড়েছিল। প্রাচীন কালে এই অঞ্চলের কাছাকাছি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে এক বিরাট সভ্যতা ও শক্তিশালী রাজত্বের উদ্ভব হয়, পরে, চতুর্থ থেকে নবম শতাব্দীতে প্রেম এবং কামের দেবতার নামে যা কামরূপ নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। মাতৃদেবীর আরাধনা এবং শিবের কাহিনির সঙ্গে এই ঐতিহ্যের সংযোগ ছিল সুপ্রাচীন, কিন্তু বৈষ্ণবধর্মও একে অগ্রাহ্য করেনি, বরং নরকাসুর, ভূমি দেবী এবং আরও পরের নারায়ণ-উপনিষদের গল্প তৈরি করেছিল। মাতৃশক্তির এই আরাধনার ঐতিহ্য এতই শক্তিশালী যে, দেবীর ঋতুচক্রের প্রতীক স্বরূপ ছোট ছোট লাল কাপড়ের টুকরোকেও লক্ষ লক্ষ ভক্ত মাথায় তুলে রাখেন। এখানে খেয়াল করা ভাল, লাঙ্গল কথাটা এসেছে লিঙ্গ থেকে— লাঙ্গল ভূমির গভীরে প্রবেশ করে ফসল ফলায়। জীবন এবং প্রজনন সম্পর্কে লজ্জার কোনও কারণ আমাদের প্রাচীন ঋষিরা দেখেননি। লক্ষণীয়, অম্বুবাচির এই সময়টাতে মাঠে লাঙ্গল দেওয়া নিষিদ্ধ।

শুধু অসমে নয়, ওড়িশাতেও এই আচার পালিত হয়। সেখানে জুনের মধ্যভাগে চার দিনের ‘রাজো’ বা মিথুন সংক্রান্তি উৎসবে জননী ধরিত্রীর ঋতুকাল পালন করা হয়, বর্ষার আগমন ও চাষের মরসুমের সূচনাকেও অভ্যর্থনা জানানো হয়। মেয়েরা এই সময় ঘরের কাজ থেকে অব্যাহতি পায়, তাদের রান্না করতে হয় না, নানা খেলাধুলো এবং রাজো গান গাওয়ার সুযোগ মেলে। বস্তুত, এই সময় পুরুষরা তাদের খাবার সাজিয়ে দেয়, শেষে পানও খেতে দেয়।

ভূমি কর্ষণের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মাতৃতান্ত্রিক ও তান্ত্রিক ধারাটি বাংলায় প্রবল। এখানে বহু এলাকাতেই অম্বুবাচি পালিত হয়, তবে ঘরোয়া ভাবে। বড় বড় শাক্ত পীঠ থেকে ছোট ছোট মন্দিরে বা ‘থান’-এ মাতৃকাদেবীর আরাধনা চলে, তবে অসম ও ওড়িশার চেয়ে জাঁকজমক অনেক কম। বাংলায় এই উৎসবের ঝোঁকটা বিবাহিত, প্রজননক্ষম মেয়েদের থেকে সরে গিয়েছে বিধবাদের দিকে, এই ক’দিন তাঁরা কোনও রান্না করা খাবার খেতে পারেন না। দুর্গা এবং কালীর দেশ ঋতুরক্তের বাস্তব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল!

পূর্ব ভারতে, হিমালয়ের পার্বত্য এলাকায় এবং দক্ষিণের অনেক জায়গায় যে প্রবল মাতৃতান্ত্রিক বিশ্বাস ও আরাধনার প্রচলন ছিল, উত্তর ভারতের আধিপত্যকামী পিতৃতন্ত্র ক্রমে তাকে গ্রাস করে নেয়। অনেকে মনে করেন এতে হিন্দুধর্মের ক্ষতি হয়েছে। এতে মাতৃশক্তি ও পিতৃতন্ত্রের পুরনো ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। সাধারণ ভাবে, এর ফলে দৈনন্দিন জীবনে নানা বৈপরীত্য জন্ম নিয়েছে। যেমন বাড়িতে ও মন্দিরে মাতৃদেবীর পুজো হয়, কিন্তু সমাজে মেয়েদের প্রতি দুর্ব্যবহারের সীমা নেই। যা কিছু প্রাচীন, তার অন্ধ আরাধনা নিশ্চয়ই ভাল নয়, কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে আমাদের পূর্বসূরিরা সত্যিই অনেক বেশি আধুনিক মনের মানুষ ছিলেন। অন্য অনেক ধর্ম জীবনের যে বাস্তবগুলিকে দূরে সরিয়ে রাখে, তাঁরা সেগুলিকে কেবল মেনে নেননি, প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

প্রসার ভারতীর সিইও, মতামত ব্যক্তিগত